মসজিদে গিয়ে জামাআতে নারীদের নামায আদায় করা

The Greatest Nation

প্রশ্নঃ সম্মানিত উলামায়ে কিরাম! যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সাথে আপনাদের কাছে আমাদের একটি জিজ্ঞাসা – আমরা বিজ্ঞ আলিমদের থেকে শুনেছি, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে

(জামাআতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে) মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে নারীদের জন্য অনুমতি ছিলো। তারা মসজিদে হাজির হয়ে জামাআতের সাথে সামায পড়তেন। পুরুষদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, নারীরা মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়তে চাইলে পুরুষরা যেন বাধাপ্রদান না করে। ঈদের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য তো নারীদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশই ছিলো। এমনকি পর্দার জন্য যদি কোন নারীর কাছে চাদর না থাকতো, তার জন্যও নির্দেশ ছিলো সে যেন অন্তত তার বান্ধবীর চাদর দিয়ে একসাথে আবৃত হয়ে ঈদের মাঠে উপস্থিত হয়। নারীদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার স্বপক্ষে যেসব হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে তা উল্লেখ করা হলো।

“মসজিদে উপস্থিতির ব্যাপারে মহিলারা অনুমতি চাইলে তাদেরকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে নিষেধ করো না।” (মিশকাত)

“তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তবে তাকে নিষেধ করো না।” (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

আমাদের বিশ্বাস, সাহাবায়ে কিরামগণ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই নির্দেশ অন্যান্য নির্দেশের মতো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। পরবর্তীতে কে বা কারা এ প্রচলন বন্ধ করলেন? বর্তমান সময়ে এ মৃত সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা কি উলামায়ে কিরামের পবিত্র দায়িত্ব নয়? দ্বীনের কাজে সাধারণ মুসলমানদের তুলনায় উলামায়ে কেরামগণই তো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে সাধারণভাবে উলামায়ে কেরামগণ এ পবিত্র দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হচ্ছেন না কেন? এর রহস্য কি? এটা তো আমাদের বুঝে আসে না। আরো অবাক হই, যখন কেউ এই সুন্নাতটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে, তখন আলিমরাই বাধা প্রদান করেন, তাকে আর অগ্রসর হতে দেন না।

যেসব হাদিসে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নারীদের মসজিদে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেসব হাদিস কি বিশুদ্ধ হাদিস নয়? নারীদের মসজিদে যাওয়া আর জামাআতের সাথে জুমা ও ঈদের নামায আদায়ের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কি? জামাআতে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের যদি মসজিদে যাওয়া নাজায়েজ হয়ে থাকে, তবে জামাআতে নারীদের উপস্থিতির স্বপক্ষে বর্ণিত হাদিসগুলোর উত্তর কি ? অনুগ্রহ করে বিষয়টি আমাদেরকে পরিস্কারভাবে বলে সন্দেহমুক্ত হতে সহায়তা করবেন।

উত্তরঃ সমগ্র বিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ’র জন্যই সমস্ত প্রশংসা। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু

আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবীদের প্রতি দরূদ ও সালাম।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন আসমানি কিতাব আল কুরআনুল কারিম। আখেরি নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় বিশ্ববাসী লাভ করেছে ইসলামী শরীয়ত বা জীবন বিধান।

আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদাত-বন্দেগি এবং পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি ইসলামী বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হয় বটে, কিন্তু দৈহিক আমলের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে নারী পুরুষের মাঝে কিছু পার্থক্য থাকায় কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। আবার অনেক সময় প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের ফলে বিধিবিধানের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। নারীদের জামাআতে অংশগ্রহন করার জন্য ঈদগাহ বা মসজিদে যাওয়ার বিষয়টি এ ব্যাপারে অন্যতম। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে নারীদের মসজিদ গমনের যে অনুমতি ছিলো, পরবর্তীতে (সাহাবায়ে কেরামের যুগেই) ফিতনার আশংকায় তা রহিত হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে ফুকাহায়ে কেরামগণ অর্থাৎ ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ এটা স্বীকার করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় জুমা, পাঁচ ওয়াক্ত এবং দুই ঈদের জামাআতে নারীরা অংশগ্রহন করতেন। কিন্তু সেটা খায়রুলকুরুন তথা সর্বোৎকৃষ্ট যুগ ছিলো। সে সময়টা ছিলো সব রকমের ফিতনা থেকে মুক্ত। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) সে সমাজেই ছিলেন। আল্লাহ’র ওহী’র মাধ্যমে তার (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি নতুন নতুন বিধি বিধান নাযিল হচ্ছিলো। সবাই নতুন মুসলমান ছিলেন। ঈমান, আকিদা, নামায, রোজা সম্পর্কিত ইসলামী বিধানাবলির মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্যই জরুরী ছিলো। সর্বোপরি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইমামতিতে মুক্তাদি হয়ে নামায পড়ার গৌরব অর্জনের ব্যাপারটিও কম তাৎপর্যের ছিলো না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত সবার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন আর এ মহান সত্তার মাধ্যমেই ইসলামের সার্বিক বিধানাবলির বিকাস ঘটতো। তাই সে সময় নারীদের উপস্থিতির অনুমতি ছিলো। কিন্তু এটা বলার অবকাশ নেই যে, জামাআতে নামায আদায়ের জন্য পুরুষদের মতো নারীদেরও মসজিদ গমনের নির্দেশ অত্যাবশ্যকীয় ছিলো। কারন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগেই নারীদের জন্য পুরুষদের মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআতে অংশগ্রহন করা জরুরী ছিলো না।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আ’নহু) বর্ণিত একটি হাদিস বিবেচিত করা যায়, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যদি মদিনার বাড়ি ঘরগুলোতে নারী এবং শিশুদের অবস্থান না হতো, তাহলে আমি এশার জামাআত কায়েম করে যুবকদের আদেশ দিতাম - যারা জামাআতে হাজির হয়নি, তাদের ঘরবারিতে আগুন লাগিয়ে দাও।” (মিশকাত)

মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার বিধান যাদের প্রতি ছিলো, সেই সাবালক পুরুষদের অনুপস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়েই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এ হাদিসে জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ঘরে আগুন দেওয়ার ধমকি দিয়েছেন। কিন্তু ঘরে নারী, শিশু আর বৃদ্ধদের উপস্থিতির কারনে এ ধরণের শাস্তি দেওয়ার নির্দেশদানে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরত থাকেন।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, নারীরাও শিশুদের মতো জামাআতে উপস্থিতির জন্য নির্দেশিত নয় আর জামাআতের সাথে নামায আদায় করা তাদের জন্য জরুরী ছিলো না। নারীদের উপর জামাআঁতে নামায পড়ার বিধান যদি জরুরী হতো, তাহলে পুরুষদের মতো নারীদেরকেও জামাআত ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো আর শিশুদের সাথে নারীদেরকে অক্ষম মনে করা হতো না।

শুধু এই একটি হাদিসই নয়, বরং অসংখ্য হাদিস আছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআঁতের সাথে নামায আদায়ের চেয়ে নারীদের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামায পড়াই উত্তম। যেমনটি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতের সাথে নামাযের ফযিলত সাতাশ গুণ বেশী। অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে নামায পড়লে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী সওয়াব। সর্বোপরি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইমামতিতে নামায আদায় করার মতো বিশাল সৌভাগ্য অর্জনের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও নারীদের প্রতি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিশেষ নির্দেশ ছিলো, নারীরা যেন নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করে। কারন অধিক ফযিলত, সওয়াব আর সৌভাগ্য নারীদের ক্ষেত্রে এরই মাঝে নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা হচ্ছে, নারীদের অন্ধকার ও বদ্ধপ্রকোষ্ঠের নামায মসজিদে নববীতে নামায আদায় করার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মর্যাদাবান। এ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি হাদিস পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করা হচ্ছে –

হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মেয়েদের জন্য উৎকৃষ্ট মসজিদ হচ্ছে তাদের ঘরের কোণ।” (আত তারগিব ওয়াত তারহিব – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৮)

হজরত ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, “নারীদের মর্যাদা পর্দার মধ্যে নিহিত। তারা যখন ঘর থেকে বের হয়, শয়তান তাদের নিরিক্ষণ করতে থাকে। অর্থাৎ শয়তান মানুষের মনে নারীদের ব্যাপারে মন্দ চিন্তা ও কুপ্ররোচনা দিতে থাকে। নারীরা নিজ নিজ ঘরের কোণে ইবাদাত করেই আল্লাহপাকের নৈকট্য সবচেয়ে বেশী লাভ করতে পারে।” (আত তারগিব ওয়াত তারহিব – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৮)

হজরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আল্লাহ’র কাছে নারীদের সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় নামায হচ্ছে সেই নামায, যা সে তার অন্ধকার (নির্জন) ঘরে আদায় করে।” (আত তারগিব ওয়াত তারহিব – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৯)

হজরত ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা প্রদান করো না, কিন্তু তাদের জন্য (মসজিদের চেয়ে) তাদের ঘর উৎকৃষ্ট।”

হজরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “নারীদের বদ্ধঘরের নামায খোলামেলা ঘরের নামায থেকে উত্তম। ঘরের উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠে আদায় করা নামায বাড়ির সীমানার ভেতরের নামায থেকে ভালো। বাড়ির সীমানার ভিতর আদায় করা নামায মহল্লার মসজিদে আদায় করা নামায থেকে ভালো।” (আত তারগিব ওয়াত তারহিব – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৮)

হজরত উম্মে হুমাইদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, “ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি আপনার সাথে নামায আদায় করতে চাই।” রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “তোমার আকাংখা খুবই ভালো আর এটা ধর্মীয় আবেগও বটে। কিন্তু তোমার নিভৃত প্রকোষ্ঠের নামায উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠের নামাযের চেয়ে উত্তম। মহল্লার মসজিদে আদায় করা নামায আমার মসজিদের (মসজিদে নববী) নামাযের চেয়ে উত্তম।” এরপর হজরত উম্মে হুমাইদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে নিজ কামড়ার এক কোণে যেখানে বেশী অন্ধকার সেখানে নামায পড়ার জায়গা নির্মাণ করান আর সেখানেই তিনি আমৃত্যু নামায আদায় করেন। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৭)

বর্ণিত হাদিসগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলোঃ

(১) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নারীদের প্রতি জামাআতে হাজির হওয়ার নির্দেশ ছিলো না বরং শুধু

অনুমতি ছিলো। এ অনুমতির ভাষা ও আকার ইঙ্গিতও এমন ছিলো যেনো নারীরা নিজেরাই জামাআতে উপস্থিত হওয়া থাকতে বিরত থাকতে উৎসাহবোধ করেন।

(২) নারীদের মসজিদগমন মুবাহ, অর্থাৎ অনুমতি পর্যায়ের ছিলো, সেটি মুস্তাহাব, ফযিলত বা জরুরিভিত্তিক নির্দেশ ছিলো না।

(৩) হজরত উম্মে হুমাইদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইমামতিতে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে ভালোবাসতেন। এ ব্যাপারে তিনি যেমন নিজ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পেশ করেছেন, জবাবে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। আর এ কারনেই উম্মে হুমাইদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) জীবনের বাকি সময়ে নিজ ঘরের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করে গেছেন।

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার প্রতি যারা প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল, তাদের পক্ষেই সম্ভব হয় নিজেদের আবেগ অনুভূতি পরিহার করা। আমরা তো আজ এমন হয়ে গেছি, নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা বা মতের কিংবা বহুদিনের শ্রুত ধারণার বিপরীত হয়ে গেলেই সে বিষয় আমাদের গ্রহন করতে ইচ্ছা হয় না। অথচ যাদের আমরা দোহাই দেই, সেই সাহাবায়ে কিরামগণ নিজেদের আবেগ অনুভূতি বা অভিরুচিকে প্রাধান্য দেননি বরং আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছেন।

নারীদের মসজিদগমন সংক্রান্ত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়ার বিষয়টি ছিলো অনুমতি পর্যায়ের। অর্থাৎ তারা মসজিদে যেতে চাইলে বাধাপ্রদান না করা। আর নারীদের ঈদগাহে উপস্থিতির বিষয়টি ছিলো নির্দেশ পর্যায়ের। এমনকি নামাযে অংশগ্রহনে যাদের অনুমতি নেই অর্থাৎ ঋতুবর্তী মহিলা, তাদের প্রতিও ছিলো ঈদের মাঠে হাজির হওয়ার নির্দেশ।

এ কথা কারো অজানা নেই, সব নামাযের মধ্যে ফরয নামাজের গুরুত্বই বেশী। তাও জামাআতের সাথে আদায় করাই শরীয়তের কাম্য। বিভিন্ন হাদিসদৃষ্টে উলামায়ে কিরামগণের মধ্যে কেউ কেউ এ মত পেশ করেন যে, জামাআত ছাড়া নামাযই আদায় হয় না।

প্রশ্ন হচ্ছে, এমন গুরুত্বপূর্ণ নামাযের জন্য নারীদের মসজিদে যেতে চাইলে যেতে না দেওয়া, আর ঈদের নামাযে ও ঈদের মাঠে হাজির হওয়ার জন্য রয়েছে নির্দেশ। সাহাবায়ে কিরামের আমল ও হাদিস ব্যাখ্যাতাদের ব্যাখ্যার আলোকে এর অন্তর্নিহিত কারন কি?

সর্বপ্রথম আমাদের এ বিষয়টি তলিয়ে দেখতে হবে। তখনই কেবল বর্তমান যুগে নারীদের মসজিদগমনে কেন অনুমতি নেই তা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

সাহাবায়ে কিরামগণের কাজ ও সিদ্ধান্তের আলোকে নারীদের মসজিদগমন সংক্রান্ত হাদিসগুলো কেবল অনুমতি পর্যায়েরই ছিলো, মসজিদে যাওয়াটা ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব পর্যায়ের ছিলো না। অন্যথায় পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামগণ নারীদের মসজিদ গমনে বাধা প্রদান করতেন না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন
–

“মসজিদে চাইলে আসতে পারো, কিন্তু তোমাদের জন্য নিজ ঘরেই নামায পড়া উত্তম।”

“মসজিদে যেতে চাইলে বাধা প্রদান করো না, কিন্তু তাদের জন্য তাদের নিজ ঘরেই নামায পড়া উত্তম।”

নারীদের নিজ ঘরে নামায পড়া উত্তম বলা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নারীদেরকে মসজিদ গমনে বাধা দেওয়া হলো না কেন?

এ প্রসঙ্গে হাদিস ব্যাখ্যাতাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নতুন নতুন বিধিবিধান অবতীর্ণ হতো। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংস্পর্শে থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা সবার মনেই ছিলো। তাই শর্ত সাপেক্ষে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাদের জন্য জুমা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শরীক হওয়ার অনুমতি ছিলো। আর ঈদের নামাযে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াও শত্রুদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শনই ছিলো মূল লক্ষ্য। তাই ঋতুবর্তী নারীদের প্রতিও ঈদগাহে হাজির হওয়ার নির্দেশ ছিলো। যতদিন এ প্রয়োজন বহাল ছিলো আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেওয়া শর্ত পালনে নারীদের পক্ষ থেকেও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি, ততদিন নারীদের মসজিদ গমনের অনুমতিও বহাল ছিলো। কিন্তু যখন নারীদের পক্ষ থেকেও ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে থাকলো, শিক্ষা প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হলো, তখন সাহাবায়ে কিরামগণের যুগেই নারীদের মসজিদে যাওয়া রহিত করা হলো।

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নারীদের মসজিদে যাওয়ার বৈধ পর্যায়ের যে অনুমতি ছিলো, তা শর্ত বিহীন ছিলো না। শর্ত ছিলো যে, তারা যেন সাজসজ্জা করে, দামী পোশাক পড়ে, সুগন্ধি ও প্রসাধনীদ্রব্য ব্যবহার করে, আকর্ষণীয় অলংকারাদি পড়ে মসজিদে না আসে; বরং একেবারে সাধারণ পোশাক পরে আসে। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু’মিনীন হজরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বিবেচনা করা যায়।

হজরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বলেন, একবার রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে বসা ছিলেন। তখন মুজাইন গোত্রের এক মহিলা খুব সাজসজ্জা করে মসজিদে প্রবেশ করে। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা দেখে বললেন, “হে লোকসকল, তোমাদের নারীদের সাজসজ্জা করে মসজিদে আসা থেকে বারণ করো। কারন বনি ইসরাইলের নারীরা যখন সাজসজ্জা করে মসজিদে জমায়েত হয়ে আত্ম প্রদর্শনী শুরু করলো, তখনই তারা অভিশপ্ত হলো।” (ইবনে মাজাহ)

হাদিস থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নারীদের মসজিদে যাওয়ার যে অনুমতি আর অধিকার প্রদান করা হয়েছিলো, তা ছিলো শর্ত সাপেক্ষ এবং নারীঘটিত ফিতনা-ফাসাদ সংঘটনের আশংকা দেখা দেওয়ার আগে।

এরপর হজরত উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) এর যুগে যখন নারীদের মাঝে স্বাধীন চলাফেরা আর বেপরোয়া চালচলন পরিলক্ষিত হয় এবং ফিতনার প্রবল আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তখন আমিরুল মু’মিনীন উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামগণের সাথে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করেন, এখন থেকে নারীরা যেন মসজিদে না আসে। সমকালীন সাহাবীরা এ নির্দেশ পছন্দ করে এ রায়ের প্রতি সম্মতি দেন।

বাদাঈউস সানাঈ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) এর বর্ণনার ভিত্তিতে যুবতী মেয়েদের মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণের অনুমতি নেই। কেননা, ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে তিনি যুবতী মেয়েদের জামাআতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। ফিতনা হারাম, আর যে কাজ মানুষকে হারামের দিকে ধাবিত করে সেটাও হারাম।

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে নারীদের মসজিদে গমনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম যে এক পর্যায়ে এসে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে (ইজমা) নারীদের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন, এর তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাউই (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি) এর হুজ্জাতুল্লিল বালিগা কিতাবে –

“যেসব বিশেষ কারনে জামাআতের সাথে নামায আদায় না করার অনুমতি আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফিতনা ফাসাদের সমূহ সম্ভাবনা বা আশঙ্কা। যেমন, কোন নারীর সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করে জামাআতে আগমন। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ – “তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদ গমনের অনুমতি চায় তবে তাকে বাধা দিও না” – এর সাথে সাহাবায়ে কিরামগণের পরবর্তীকালীন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত – “এখন থেকে নারীদের মসজিদে আসতে নিষেধ করা হোক” – এর মাঝে বাহ্যত বিরোধ মনে হলেও মূলত কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ নেই।

কেননা, কতৃত্বমূলক মনোভাব নিয়ে যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করে, তবে সেটা দোষণীয়। পক্ষান্তরে, ফিতনার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে কেউ যদি আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে নিজ স্ত্রীকে বাধা দেয়, তবে সেটা শুধু বৈধই নয় বরং প্রশংসিতও বটে। বস্তুত, সাহাবায়েকিরামগণ এই ফিতনার ভয়েই নারীদের জামাআতে অংশগ্রহণে নিষেধ করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। নারীদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য সাহাবায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তা মূলত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই বাণীর বাস্তবায়ন – ‘আত্মমর্যাদাবোধ দুই প্রকার – এক, যা আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয়; দুই, যা আল্লাহ পাকের কাছে অপছন্দনীয়।’

আল্লাহ পাকের কাছে যে আত্মমর্যাদাবোধ পছন্দনীয় তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাহাবায়ে কেরামগণের সিদ্ধান্তে। উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আ’নহা) বলেছেন – ‘নারীরা এখন যা করছে তা যদি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতেন, তবে অবশ্যই এদেরকে মসজিদে যাওয়া নিষেধ করে দিতেন’ – এ উক্তির মাঝে ও প্রতিফলন ঘটেছে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীর।” (হুজ্জাতুললিল বালিগা – খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬)

বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আইনি’ তে উল্লেখ আছে, “উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) শুক্রবারে মসজিদে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর পাথরকণা মেরে নারীদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন।”

আর এ কাজ তিনি সাহাবীদের উপস্থিতিতেই করতেন। এমনিভাবে –

“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আ’নহু) ও শুক্রবারে নারীদের মসজিদ থেকে বের করে দিতেন আর বলতেন, ‘তোমরা তোমাদের ঘরে চলে যাও, তোমাদের ঘরই তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট।’ ”

এটাও সাহাবীদের উপস্থিতিতে হতো।

উম্মুল মু’মিনিন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আ’নহা) তার সময়ে নারীদেরকে পর্দার ব্যাপারে অমনোযোগী ও সাজসজ্জার প্রতি আকৃষ্ট দেখে এ মন্তব্য করেছিলেন – “রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি নারীদের বর্তমান এ অবস্থা দেখতেন, তাহলে এদেরকে অবশ্যই মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতেন। বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের নারীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিলো।” (বুখারি – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২০; মুসলিম – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৩)

বুখারি শরীফের ভাষ্যকার বদরুদ্দিন আইনি (রহমাতুল্লাহি আ’লাইহি) বলেন, “বর্তমান সময়ের নারীদের অবস্থা তো পূর্ববর্তীদের তুলনায় আরো অনেক শোচনীয়।”

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি) তার সময়ের নারীদের ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত ঘৃণ্য কাজগুলোর যে আলোচনা করেছেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, নারীরা সে যুগে নিজেদের সাজসজ্জা, চুলের কাটিং ও পোশাক পরিচ্ছেদ যেসব ফ্যাশন আবিস্কার করেছে এবং খোলামেলা চলাফেরায় যেভাবে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, বিশেষত মিসরীয় মহিলারা; যদি আয়েশা (রদিয়াল্লাহু ‘আনহা) এ অবস্থায় তাদের দেখতেন, তাহলে নারীদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে আরো কঠোরভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি) বলেন – “নারীদের অসতর্কতা ও খোলামেলা চলাফেরার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) যে মন্তব্য করেছিলেন, সে সময়টা ছিলো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকালের কিছুদিন পরের কথা। সে কালের নারীদের বেপরোয়া চলাফেরা বর্তমান সময়ের (আল্লামা আইনি’র যুগের) নারীদের স্বাধীন ও বেপরোয়া চলাফেরা হাজার ভাগের এক ভাগেরও ছিলো না। এখনকার নারীদের চলাফেরা যদি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) দেখতেন, তাহলে কি মন্তব্য করতেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। (ভাবার্থ)”

বদরুদ্দিন আইনি তার কিতাবে যে যুগের কথা আলোচনা করেছেন, সেটি হিজরি নবম শতাব্দীর কথা। বিংশ শতাব্দীর এ যুগের নারীবাদের আকর্ষণীয় শ্লোগানের আবরণে পাশ্চাত্যের উলঙ্গ সংস্কৃতি আজ প্রতিনিয়তই আমাদের সমাজকে গ্রাস করছে। নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে মাতৃজাতিকে অবমাননাকর জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এ যুগে নারীদের বেপরোয়া চলাফেরা পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক আগেই সীমালঙ্ঘন করেছে। হিজাব বোরকা প্রায় বিদায় নিয়েছে, এর জায়গা নানা রকম ফ্যাশনেবল পোশাক দখল করে নিয়েছে। প্রায় জায়গাতেই মহিলাদের খোলামেলা চলাফেরা করতে দেখা যায়। এমন এক বিপর্যয়ের সময় রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বরকতময় যুগের দোহাই দিয়ে মা-বোনদের মসজিদ ও ঈদগাহে আনার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের শ্রুতিমধুর শ্লোগানে!

এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আবশ্যক পরিমাণ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরই ফরয। কিন্তু মা- বোনদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাকে মসজিদ গমনের সাথে সংশ্লিষ্ট করাটা কতটুকু বাস্তবসম্মত? পাঁচ ওয়াক্ত জামাআত অনুষ্ঠিত হয় যেসব মসজিদে সে সব নারীর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কোথায়? বর্তমানে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার পৃথক মাদরাসা আছে। প্রাইভেটভাবে লেখাপড়ার ব্যবস্থাও আগের তুলনায় খুবই সহজলভ্য। তাই শিক্ষা প্রদানের অজুহাতে বা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বর্ণ যুগের সাথে তুলনা করে আর উম্মতের সর্বসম্মত রায়ের (ইজমার) বিরোধীতা করে নারীদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়টিকে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ বা যৌক্তিকতা কোথায়?

মা-বোনেরা সাধারণত বৈধ বা অনুমতি পর্যায়ের একটি আমল করতে মসজিদে যাবেন ফরয ত্যাগের ঝুঁকি নিয়ে – এটাই বা কতটুকু বাস্তবসম্মত হবে, সেটা আসলে বোধগম্য নয়। সত্যিই দুঃখ হয় তাদের প্রতি, যারা বর্তমানে নারীদেরকে মসজিদে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। কারন এরা তো সরাসরি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত নির্দেশ দিচ্ছেন।

আরো দুঃখজনক হচ্ছে, তারা তাদের এ কাজকে সুন্নাত বলছেন! নারীদের জন্য যদি জামাআতে হাজির হওয়া সুন্নাতই হতো, তাহলে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে নববীর নামাযের চেয়ে নারীদের জন্য মহল্লার মসজিদের নামাযকে আর মহল্লার মসজিদের নামাযের চেয়ে ঘরের নামাযকে উৎকৃষ্ট বলতেন না।

একটি ভুল ধারণার অবসান

নারীদের মসজিদে যাওয়া সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণনার সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রদিয়াল্লাহু আ’নহু) ছেলের প্রতিবাদ ও ছেলের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার ঘটনা নারীদের মসজিদে যাওয়ার স্বপক্ষে দলীল হতে পারে না। কারন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রদিয়াল্লাহু আ’নহু) নিজেই তো জুমার মসজিদে আসা মহিলাদের পাথরকণা নিক্ষেপ করে বের করে দিতেন, যেমনটি বের করে দিতেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আ’নহু)।

আত তারগিব ওয়াত তারহিব নামক হাদিস গ্রন্থের ১ম খন্ডের ১৯০ পৃষ্ঠা, আইনি শরহে বুখারির ২৩৩ পৃষ্ঠা এবং আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রদিয়াল্লাহু আ’নহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “নারীদের মসজিদ গমনে বাধা প্রদান করো না, তবে তাদের জন্য ঘরে নামায পড়াই উত্তম।”

ঘরে নামায পড়া যখন তাদের জন্য উত্তম, তাহলে মসজিদে যাওয়া যে তাদের জন্য রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং অনুত্তম বলেছেন তা কারো না বুঝার কথা না। আবার এ হাদিসে বর্ণনাকারী স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে উমারই একটি অনুত্তম কাজে নারীদের অগ্রসর হওয়ার পক্ষে নিজের ছেলের মুখে বাধা প্রদানের কথা শুনে রাগান্বিত হওয়ার কথা নয়। তবে তিনি রাগান্বিত হলেন কেন?

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহমাতুল্লাহি আ’লাইহি) বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে লিখেছেন, “প্রতিবাদ করার কারণে ইবনে উমারের তার ছেলের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার রহস্য হচ্ছে, বাধা কেন দিচ্ছে এর কারন উল্লেখ না করে,

এমনভাবে প্রতিবাদ কেন করলো, যা (বাহ্যিকভাবে) হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। নতুবা যদি এমনভাবে বলতেন - বর্তমান অবস্থায় বাধা প্রদান করা প্রয়োজন; কারন কোন নারী এমনও করতে পারে, মসজিদ গমন হবে তার বাহ্যিক অবস্থা, উদ্দেশ্য থাকবে অন্য কিছু; - তবে ইবনে উমার হয়তো রাগান্বিত হতেন না।” (ফাতহুল বারী – খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০৫-৪০৬)

মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা নববী এ ক্ষেত্রে এটাই বলেছেন। (দেখুনঃ ইমাম নববীর শরহে মুসলিম – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৩)

আল্লামা নববী ও মুল্লা আলি ক্বারি প্রমুখ উলামায়ে কেরামের অভিমত এটাই। আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বজলুল মাজহুদেও এটাই বলা হয়েছে – ইবনে উমার রাগান্বিত হওয়ার কারন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি যা বলেছেন সেটাই।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (রহমাতুল্লাহি আ’লাইহি) এর সময়ের একটি ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একদিন হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) কদু তরকারি পছন্দ করতেন। ক্লাসের অংশগ্রহণ কারী একজন ছাত্র বলে উঠলো, আমি কদু পছন্দ করি না। ইমাম আবু ইউসুফ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজ তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন, তুমি নতুনভাবে কলেমা পড়ে ঈমান আনো, নয়তো আমি তোমাকে হত্যা করবো।

বাহ্যত ছাত্রের উক্তি দ্বারা হাদিসের বিরোধীতার বিষয়টি চোখে লাগায় ইমাম আবু ইউসুফ তার ছাত্রের প্রতি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। নতুবা কদুর মতো একটি তরকারি পছন্দ করা বা না করার অভিরুচি প্রকাশ করা এমন কোন অপরাধ নয় যে, এর অপরাধীকে হত্যা করতে হবে। এমনিভাবে, নারীদের মসজিদ গমনে বাধা প্রদান করার আমল এমন কোন অপরাধ নয় যে, বাধা প্রদানকারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরী হয়ে পড়ে। স্বয়ং উবনে উমারও নারীদেরকে শুক্রবারে পাথরকণা দিয়ে আঘাত করতেন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাধ্য করতেন। (মিরকাত শরহে মিশকাত – খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৬)

নারীদের ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে যেসব হাদিসের বর্ণনায় আদেশসূচক পদ আছে আর যার উদ্ধৃতি দিয়ে ঈদগাহে যেতে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে দলীল দেওয়া হয়ে থাকে, তার উত্তর হচ্ছে –

আরবিতে আমর বা আদেশসূচক পদ সাধারণত তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকেঃ

প্রথম, ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয়তা বুঝাতে, যেমনঃ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

অর্থঃ তোমরা নামায আদায় করো।

দ্বিতীয় , মুস্তাহাব অর্থে , যেমনঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

অর্থঃ অতঃপর তোমরা জবাইকৃত চতুষ্পদ জন্তু থেকে আহার করো আর দুস্থ –অভাবগ্রস্তদেরকে আহার করাও। এখানে فَكُلُوا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও এর অর্থ ওয়াজিব পর্যায়ের নয় , বরং বৈধতা প্রকাশ করা।

তৃতীয় , মুবাহ বা অনুমতি প্রদান , যেমনঃ

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

- এর এহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর আয়াতে শিকার করার আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হজের নিয়্যতে এহরাম বাধার পর শিকারের নিষেধাজ্ঞার যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিলো , এহরামমুক্ত হওয়ার পর শিকারের সে নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে গেলে তখন শিকার করা যেতে পারে। আয়াতে فَاصْطَادُوا শব্দটি আদেশসূচক ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হলে প্রত্যেক হাজীকেই এহরাম থেকে হালাল হওয়ার সাথে সাথেই কোন কিছু জরুরী হয়ে পড়তো, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।

এখন আমাদের দেখতে হবে, মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কিত হাদিসগুলোতে আদেশসূচক পদগুলো কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয়তার অর্থে অবশ্যই এখানে ব্যবহৃত হয় নি , কারন এটা তো কেউই দাবী করে না যে , ঈদের জামাআতে অংশগ্রহণ করা নারীদের উপর ওয়াজিব। মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এটা বলারও অবকাশ নেই। কারন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের বেলায় ঘরের নামাযকে মসজিদে নববির নামাযের চেয়েও উত্তম বলেছেন। সাধারণত মসজিদ ঘরের সন্নিকটেই হয়ে থাকে। এরপরও রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের নামাযকে উত্তম বলেছেন। ঈদগাহ সাধারণত শহর থেকে দূরে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত যা বিবেচনাযোগ্য তা হলো , জুমা আর পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের জন্য যখন নারীদের মসজিদে যাওয়া উত্তম কাজ হচ্ছে না , তাহলে কি করে ঈদের জামাআতে উপস্থিতির অনুমতি উত্তম হতে পারে ?

ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের মতামত

ফকিহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহমাতুল্লাহি আ ’লাইহি) বলেন, “বর্তমান যুগে নারীদের জামাআতে অংশগ্রহণ করা বিষয়ে ফতোয়া হচ্ছে , প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জামাআতে - হোক সেটা রাতে বা দিনের , তাতে নারীদের অংশগ্রহণ করা নিষেধ। যুবতী -বয়স্কা নির্বিশেষে সব নারীর বেলায়ই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। ‘আল জামাআত’ বহুবচন শব্দে জুমা , দুই ঈদ , ইসতিসকার নামায ও ওয়াজের মজলিসও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। বিশেষ করে অশিক্ষিত , অল্পশিক্ষিত সেসব ব্যক্তির বৈঠক মজলিসও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসে যায় , যারা পীর ফকিরদের লেবাসধারী আর পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এসব আয়োজন করে থাকে।” (আইনি শরহে কানজ – খণ্ড ১ , পৃষ্ঠা ৪০)

দুররে মুখতার কিতাবে বলা হয়েছে , “জামাআতে নারীদের হাজির হওয়া মাকরূহ – হোক সেটা জুমা বা ঈদের জামাআত বা ওয়াজের মজলিস। বয়স্ক নারীদের জন্য রাতের বেলায় জামাআতে অংশগ্রহণের যে অনুমতি , বর্তমানে ফিতনার আশংকায় তাও মাকরূহ। ” (দুররে মুখতার , শামি – খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২৯)

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে , “বর্তমান সময়ে নানা ধরণের ফিতনা ফাসাদের কারনে নারীদের যেকোন জামাআতে (জুমা , ঈদ, ওয়াক্তিয়া নামাযের জামাআতে) অংশগ্রহণ করা মাকরূহ। ” (আলমগীরী – খণ্ড ১ , পৃষ্ঠা ৫৬)

নারীরা যেন কোন জামাআতে অংশগ্রহণ না করে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ –

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

অর্থঃ তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো ,

আর হাদিসে আদেশ – “তাদের নামায তাদের ঘরে উত্তম ” – এর আলোকে।

প্রসিদ্ধ ফিকাহের কিতাব কানুজুদ্দাকায়েক এর লেখক ‘কাফি’ তে বলেছেন, “বর্তমান যুগে ফিতনার আশংকায় ফতোয়া হচ্ছে , নারীদের সব জামাআতে অংশগ্রহণ করা মাকরুহে তাহরীমী। ” (বাহরুর রায়েক – খণ্ড ১ , পৃষ্ঠা ৩৫৮)

রাসায়েলুল আরকান কিতাবে বলা হয়েছে , “নারীদের জামাআতে অংশ গ্রহণের অনুমতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিতনামুক্ত নিরাপদ পরিবেশের কারনে ছিলো। বর্তমানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারনে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ। তাই বর্তমান যুগে এটাই উচিত , নারীরা যেন

জামাআতে উপস্থিত না হয়। কারন কুরআন হাদিসের বিধান অনুসারে তাদের মতে জামাআতে হাজির হওয়া জরুরী নয়। পক্ষান্তরে, কুরআন–হাদিসের আলোকে হুকুম হচ্ছে, ফিতনা ফাসাদ পরিহার করা ওয়াজিব। আর সর্বসম্মত রায় হচ্ছে, যা হারাম কাজের কারন হয়, সেটাও হারাম।” (রাসায়েলুল আরকান – পৃষ্ঠা ১৯১)

মূলঃ “নারীদের মসজিদ গমন – সেকাল একাল” (মাওলানা মুস্তফা আযাদ)